ইউনিট- ১: শিক্ষাক্রমের ধারণা
[Concept of Curriculum]

ভূমিকা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড ও উন্নয়নের চাবিকাঠি। একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়নের ও ভবিষ্যত নির্মাণের হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। উন্নত জীবনযাপন ও সমাজের অগ্রগতি আনয়নে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর শিক্ষাকে সঠিকভাবে রূপদানের জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্রম। আধুনিক অর্থে যে কোন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার সুবিন্যস্ত পরিকল্পনাকেই বলা হয় শিক্ষাক্রম। যে কোন শিক্ষা কার্যক্রম কী উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে, কী বিষয়বস্তুর মাধ্যমে উদ্দেশ্য অর্জিত হবে, কখন, কীভাবে, কার সহায়তায় এবং কী উপকরণের সাহায্যে তা বাস্তবায়িত হবে, শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে ইত্যাদি সম্পর্কিত যাবতীয় পরিকল্পনার রূপরেখাই হলো শিক্ষাক্রম। তবে শিক্ষাক্রম ধারণার উৎপত্তির শুরুতে শিক্ষাক্রম সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হতো। ধীরে ধীরে সময়ের পরিক্রমায় তা শিক্ষা কর্মকাণ্ড পরিচালনার সামগ্রিক পরিকল্পনা হিসেবে রূপ পেয়েছে এবং শিক্ষাক্রম নিয়ে আরও নতুন নতুন গবেষণা হচ্ছে ও এ সম্পর্কিত আরও নতুন নতুন ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবশ্যই এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

এ ইউনিটে শিক্ষাক্রমের ধারণাগত বিকাশ, এ সম্পর্কে মনীষীদের ধারণা, কার্যকর সংজ্ঞা ও উপাদান, লক্ষ্য, ভিত্তি, প্রকৃতি ও পরিসর, প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিমালা ও আধুনিক গতিধারা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র বিষয়বস্তুকে নিচের তিনটি পাঠে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পাঠ- ১.১: শিক্ষাক্রমের ধারণাগত দিক

পাঠ- ১.২: শিক্ষাক্রমের মৌলিক ধারণা

পাঠ- ১.৩: শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিমালা ও আধুনিক গতিধারা

পাঠ- ১.১ : শিক্ষাক্রমের ধারণাগত দিক
[Conceptual Aspects of Curriculum]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- 'শিক্ষাক্রম' পদের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রমের প্রাচীন ও আধুনিক ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের ধারণা উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রমের কার্যকরী ধারণা ও উপাদান উল্লেখ করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম পদের উৎপত্তি

শিক্ষাক্রমের ইংরেজি পরিভাষা Curriculum। এটি ল্যাটিন শব্দ 'currere' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'course of study' অর্থাৎ 'পাঠ্যবিষয়'। আবার কেউ কেউ মনে করেন এটি ল্যাটিন শব্দ 'currer' থেকে এসেছে। এর অর্থ হল 'ঘোড় দৌড়ের মাঠ'। শাব্দিক অর্থে যাই হোক না কেন, আভিধানিক অর্থে শিক্ষাক্রম বলতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য পরিচালিত কোর্সকে বুঝায়।

শিক্ষাক্রমের প্রাচীন ধারণা

আক্ষরিক অর্থে যাই হোক না কেননা শিক্ষাক্রম শব্দটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং যুগের পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় শিক্ষাক্রমের ধারণা ক্রমাগত বিবর্তিত হচ্ছে। তাই শিক্ষাক্রমের সর্বজনস্বীকৃত কোন একক সংজ্ঞা বা ধারণার উদ্ভব হয়নি। যেমন, প্রাচীনকালে মানুষের বেঁচে থাকার দক্ষতা অর্জনই ছিল শিক্ষার প্রতিপাদ্য বিষয়। ফলে তখনকার অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় এ দিকটি গুরুত্ব পেয়েছে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে শিক্ষা সম্পর্কিত মানুষের চিন্তার ফসল হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাক্রমের ধারণা বাস্তব রূপ পেতে থাকে।

আমেরিকায় শিক্ষাক্রমের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায় ১৮২০ সাল থেকে। সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাক্রম বলতে মূলত 'course of study' বা কতগুলো পাঠ্যবিষয়কে বুঝাত, যা অনুসরণ করে শিক্ষক শ্রেণিতে পাঠদান করতেন। সে সময় শিক্ষাক্রমের মূল ফোকাস ছিল শিশুর মানসিক এবং জ্ঞানের বিকাশ। এজন্য শিক্ষাক্রমে বংশানুক্রমিক সুসংবদ্ধ জ্ঞান ও মানসিক শৃঙ্খলা অর্জনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। প্রাচীনপন্থী শিক্ষাবিদদের ধারণা ছিল যে, শিশুর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ ঘটাতে হলে বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে কতগুলো অপরিহার্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এগুলো হলো মাতৃভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ও পশ্চিমা দেশের ভাবধারা। ফলে সে সময় শিক্ষাক্রমে এ বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হতো।

শিক্ষাক্রম আধুনিক ধারণা

১৯৩০ সালের পর থেকে শিক্ষাক্রমের প্রাচীন ও সংকীর্ণ ধারণার পরিবর্তন হয়ে শিক্ষাক্রমের ধারণার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। এসময় শিক্ষাক্রম বলতে স্কুল কর্তৃক পরিচালিত সকল শিখন অভিজ্ঞতার সমষ্টিকে বুঝানো হতো। এ প্রসঙ্গে ১৯৩৫ সালে ক্যাসওয়েল ও কম্পবেল (Caswell and Compbell) শিক্ষাক্রমের পুরাতন ধারণার অবসান ঘটিয়ে একটি নতুন সংজ্ঞা প্রস্তাব করেন– "শিক্ষাক্রম হল শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষার্থীর অর্জিত সকল অভিজ্ঞতা"। সে সময়ের অন্যান্য শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণও (Smith et. al, 1957 এবং Korr, 1968) শিক্ষাক্রমের এ ধারণাকে সমর্থন করেন। এভাবে শিক্ষাক্রম তার সংকীর্ণ ধারণার গণ্ডি পার হয়ে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে এবং শিক্ষাক্রম কেবলমাত্র পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তে স্কুলের নিয়ন্ত্রিত সকল শিখন-অভিজ্ঞতার সমষ্টিরূপে পরিগণিত হতে থাকে। কিন্তু তার পরও প্রশ্ন থেকে যায় স্কুল কর্তৃক শিক্ষার্থীদের কোন কোন অভিজ্ঞতা প্রদান করা হবে? অর্থাৎ তাদেরকে কী শেখানো হবে? শিক্ষার্থী ও বৃহত্তর সমাজই বা স্কুলের কাছে কোন অভিজ্ঞতাগুলো প্রত্যাশা করে? তাছাড়া স্কুল কর্তৃক প্রদত্ত অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে কোনগুলো সমাজের জন্য কাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত তা শিক্ষাক্রমের এই ব্যাপক ধারণা থেকে বোঝা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ শিক্ষাক্রমের আরও সুস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য ধারণার অনুসন্ধান করতে থাকেন।

১৯৪৯ সালে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ রাফ টাইলার কর্তৃক প্রদত্ত ধারণায় শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত এ সমস্যার কিছুটা সমাধান পাওয়া যায়। তিনি সর্বপ্রথম বলেন– শিক্ষাক্রম হল শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্কুল কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত এবং শিক্ষার্থীর অর্জিত সকল শিখন অভিজ্ঞতা। এতে দেখা যায় তিনি শিক্ষাক্রমকে স্কুল পরিচালিত সকল কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যভিত্তিক ও পরিকল্পিত শিখন অভিজ্ঞতা নির্ভর করার উপর জোর দিয়েছেন। ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি শিক্ষার্থীর জীবনে স্কুলের প্রভাব প্রকটরূপে দেখা যায়। ফলে এ সময় শিক্ষাক্রমের ধারণা পরিমার্জন ও পরিবর্তনের ব্যাপারে আমেরিকায় বেশ কিছু শিক্ষামূলক প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু শিক্ষাবিদ শিক্ষাক্রমকে পাঠ-পরিকল্পনা (Instructional Plan) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন (Taba, 1962; Hirst, 1974; Saylor and Alexonder, 1974)।

ষাটের দশকের শেষে এবং সত্তরের দশকের প্রথমে অনেকে স্কুলের কাজকে শিল্প কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করেন। শিল্প কারখানায় যেমন কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাত করে নানারকম দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয়, তেমনি স্কুলের কাজ হবে নিরক্ষর ও অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীদের দক্ষ, অভিজ্ঞ ও অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। এর ফলে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন এবং স্কুলের জবাবদিহিতার প্রশ্ন গুরুত্ব পেতে থাকে। ফলে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মত করার মানসে এ সময় শিক্ষাক্রমে আচরণিক উদ্দেশ্য লেখার ওপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে এ সময় থেকে শুরু করে পরবর্তীতে বিভিন্ন মনীষী কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষাক্রমের ধারণায় শিক্ষাক্রমের এই পরিবর্তিত ও সুনির্দিষ্ট রূপ গুরুত্ব পেতে থাকে। এভাবে সময়ের পরিক্রমায় শিক্ষাক্রমের ধারণায় নতুন নতুন মাত্রা সংযোজিত হয় ও পুরাতন ধারণার পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

শিক্ষাক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীদের ধারণা

নিচে কয়েকজন মনীষীর ধারণা উল্লেখ করা হলো যা শিক্ষাক্রমের ধারণা বুঝতে সহায়ক হবে।

- হিলডা তাবা (১৯৬২), যুগের চিন্তাভাবনার অবয়বহীন ফসলই হলো শিক্ষাক্রম।
- হুইলার (১৯৬৭), শিক্ষাক্রম বলতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন, বিষয়বস্তু শনাক্তকরণ, বিষয়বস্তু সংগঠন, মূল্যায়ন ইত্যাদির একটি বৃত্তাকার গতিশীল কার্যক্রমকে বুঝিয়েছেন।

- কার (১৯৬৮), বিদ্যালয় কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত যাবতীয় শিখন যা বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের বাইরে দলগত বা ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন করা হয় তাই শিক্ষাক্রম।
- পোফাম ও বেকার (১৯৭০), শিক্ষাক্রম স্কুলের সেই সকল পরিকল্পিত কার্যক্রম যা অর্জনের দায়দায়িত্ব স্কুলের ওপর বর্তায়।
- জনসন (১৯৭০), শিক্ষাক্রম হচ্ছে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা বা ফলাফল।
- ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ লটন (১৯৭৩) শিক্ষাক্রমের উপাদান অত্যাবশ্যকীয়ভাবে সামাজিক কৃষ্টি থেকে নির্বাচিত করতে হবে।
- মার্শ এবং স্ট্যাফোর্ড (১৯৮৮), শিক্ষাক্রম হলো 'পরিকল্পনা' ও 'অভিজ্ঞতার' পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একটি সেট যা শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পন্ন করে।

শিক্ষাক্রমের কার্যকর সংজ্ঞা ও উপাদান

শিক্ষাক্রমের বিবর্তন এবং উপরিল্লিখিত ধারণাগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায় শিক্ষাক্রমের ধারণা যুগ যুগ ধরে নিম্নোক্তভাবে বিবর্তিত হয়েছে। যেমন: শিক্ষাক্রম হচ্ছে–

১। বংশানুক্রমিক সুসংবদ্ধ জ্ঞান
২। মানসিক শৃঙ্খলা
৩। স্কুল নিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতা
৪। পরিকল্পিত শিখন অভিজ্ঞতা
৫। শিক্ষাদান পরিকল্পনা
৬। আচরণিক উদ্দেশ্য/শিখনফল
৭। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা
৮। শিখন প্রক্রিয়া
৯। পারদর্শিতা ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন

এ সকল দিক ব্যাখ্যা করে Daniel Tanner and Laurel N. Tanner ১৯৮০ সালে শিক্ষাক্রমের একটি কার্যকর সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করেন–

"Curriculum is that reconstruction of knowledge and experience, systematically developed under the auspices of the school (or university) to enable the learner to increase his or her control of knowledge and experience"

শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে এর চারটি মূল উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়–
(১) উদ্দেশ্য
(২) বিষয়বস্তু
(৩) শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল
(৪) মূল্যায়ন

অর্থাৎ কোন শিক্ষা কার্যক্রম কী উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে, কোন বিষয়বস্তু পাঠের মাধ্যমে উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিত হবে, কোন পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা তা শিখবে এবং শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে– এ সম্পর্কিত সকল নির্দেশনার সমষ্টিই হল শিক্ষাক্রম।

এগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, নির্ভরশীল এবং পরিপূরক। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নকালে এর প্রত্যেকটি উপাদান সম্পর্কে গভীর মনোযোগ দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাক্রম হচ্ছে একটি ব্যাপক ধারণা যার মধ্যে রয়েছে জাতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি থেকে শুরু করে বর্তমান ও ভবিষ্যত মানবসম্পদ গড়া ও শিক্ষার্থীদেরকে কর্মে নিয়োজিতকরণের একটি সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনার দিক নির্দেশনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. আভিধানিক অর্থে শিক্ষাক্রম বলতে কী বুঝায় ?
   ক. শিক্ষাক্রম পদ্ধতি ও কৌশল
   খ. নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পরিকল্পনা
   গ. ঘোড় দৌড়ের মাঠ
   ঘ. পাঠ্যবিষয়ের সমষ্টি

২. কোনটি শিক্ষাক্রমের আধুনিক ধারণা নির্দেশ করে?
   ক. মানুষের বেঁচে থাকার দক্ষতা অর্জন
   খ. মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন
   গ. দর্শন ও পশ্চিমা দেশের ভাবধারা জানা
   ঘ. উদ্দেশ্যভিত্তিক ও পরিকল্পিত শিখন

৩. প্রাচীন ধারণায় শিক্ষাক্রমের মূল ফোকাস কোনটি ছিল?
   ক. শিশুর মানসিক এবং জ্ঞানের বিকাশ
   খ. শিশুর দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ
   গ. উদ্দেশ্যভিত্তিক ও পরিকল্পিত শিখন
   ঘ. অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

৪. "বিদ্যালয় কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত যাবতীয় শিখন যা বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের বাইরে দলগত ও ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন করা হয় তাই শিক্ষাক্রম"– কে বলেছেন?
ক. রাফ টাইলার
খ. হিলডা তাবা
গ. হুইলার
ঘ. কার

সঠিক উত্তরঃ ১। খ; ২। ঘ; ৩। ক; ৪। ঘ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম শব্দের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করুন।
২. প্রাচীনকালে শিক্ষাক্রম সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা কী ছিল?
৩. শিক্ষাক্রমের ধারণার আধুনিকায়নে রাফ টাইলরের অবদান বর্ণনা করুন।
৪. শিক্ষাক্রম সম্পর্কে হুইলারের ধারণা কী ছিল?
৫. বিভিন্ন যুগে শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাগুলো কী ছিল?
৬. ষাটের দশকে শিক্ষাক্রমকে কী মনে করা হত?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রমের ধারণাগত বিকাশ আলোচনা করুন।
২. শিক্ষাক্রমের কোন একক গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নেই কেন? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
৩. শিক্ষাক্রমের উপাদানগুলো উল্লেখপূর্বক এর একটি কার্যকরী ধারণা উল্লেখ করুন।

পাঠ- ১.২ : শিক্ষাক্রমের মৌলিক ধারণা
[Basic concepts of Curriculum]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রমের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রমের ভিত্তি উল্লেখ করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি ও পরিসর বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির পার্থক্য উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- সহশিক্ষাক্রমিক-এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রমের ধারণা

শিক্ষাক্রম হচ্ছে শিক্ষার একটি সামগ্রিক রূপরেখা। এটি শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটি নীল নকশা বা Road Map যা অনুসরণ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলবার কার্যকর পরিকল্পনা হলো শিক্ষাক্রম। এটি যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি।

শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য

শিক্ষাক্রমের নিজস্ব কোন লক্ষ্য নেই। কোন রাষ্ট্রের জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্যই শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত হয়। শিক্ষাক্রমের এ লক্ষ্য নির্ধারিত হয় কোন সমাজ বা রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনের পরম চাওয়ার উপর। অর্থাৎ একটি জাতি তার শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে কীভাবে গড়ে তুলতে চায় তাই হলো ঐ জাতির শিক্ষা এবং শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য নির্ধারণে যে বিষয়গুলোতে সচেতনভাবে নজর দেওয়া হয় তা হলো– নাগরিকদের জাতীয় আদর্শ, সমাজের চাহিদা, শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি, মানসিক পরিণমন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবহারের ধরন, সামাজিক রূপান্তরের দীর্ঘমেয়াদী পরিপ্রেক্ষিত, ভবিষ্যতের কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করা ইত্যাদি। এ প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীর মানসিক ও সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞান, দক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ; দেশপ্রেমিক ও কর্তব্যনিষ্ঠা; মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নাগরিক তৈরি, সৎ ও কর্মক্ষম জীবনযাপন, পরমতসহিষ্ণুতা ও সংবেদনশীলতা; আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলা ইত্যাদিকে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য নির্ধারণে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

শিক্ষাক্রমের ভিত্তি

শিক্ষাক্রমের ভিত্তি হচ্ছে জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রধান উৎস হলো জনগণের চাহিদা, প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা যা ঐ দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর ভিত্তি করে নির্ণীত হয়ে থাকে। এসব কিছুর মূল হলো জাতীয় জীবনদর্শন। জাতীয় জীবন দর্শনের মধ্যেই একটি জাতির শিক্ষাক্রমের কাঠামো ও প্রকৃতি নিহিত থাকে।

এছাড়া শিক্ষাক্রম প্রণয়নে আরও কিছু বিষয় বিবেচনা করা হয়। একটি দেশের শিক্ষাক্রমের কাঠামো সাধারণত যে সব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সেগুলো হলো–

- রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনদর্শন বা আদর্শ
- আর্থ-সামাজিক-অবকাঠামোগত অবস্থা
- সংস্কৃতিক, সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত
- জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ
- জনগণের ধর্মীয় চেতনা, বিশ্বাস ও সমকালীন জীবনব্যবস্থা
- দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা
- বস্তুগত সম্পদের প্রাপ্যতা
- শিক্ষার্থীর সমকালীন ও ভবিষ্যত চাহিদা
- সমাজের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও জরুরি চাহিদা
- ভবিষ্যত সমাজ নির্মাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের রূপরেখা।

শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি ও পরিসর

- শিক্ষাক্রম হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের বিশদ পরিকল্পনা। এটি কোন স্তরের বা বিষয়ের শিক্ষা সম্পর্কিত কর্মতৎপরতার সামগ্রিক নীলনকশা এবং কর্মসম্পাদনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।
- শিক্ষাক্রমের পরিসর বহু বিস্তৃত। শিক্ষাক্রম কেবল একটি বিষয়ে একটি শ্রেণির জন্য প্রণীত হতে পারে। আবার একটি বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ স্তরের জন্য শিক্ষাক্রম তৈরি হতে পারে। এছাড়া একটি শিক্ষাস্তর বা ধারার সকল বিষয় ও সকল স্তরের জন্যও এটি প্রণয়ন করা হয়।
- শিক্ষাক্রম প্রণয়নে যে দিকগুলো বিবেচনা করা হয় তা হলো– শিক্ষার্থীরা কী শিখবে? কখন, কীভাবে, কার সহায়তায় এবং কত সময় ধরে শিখবে? শিক্ষাদানে কী শিখন সামগ্রী ও উপকরণ ব্যবহৃত হবে? শিক্ষকের কী যোগ্যতা থাকতে হবে? শিক্ষার্থীর অর্জনকে কীভাবে পরিমাপ করা হবে? ইত্যাদি।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা, বিষয়বস্তু, শিখন-সামগ্রী প্রণয়ন, উৎপাদন, সরবরাহ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ (বিস্তরণ), ভৌত সুবিধা, সহায়ক শিক্ষা উপকরণ, শিখন অগ্রগতি পরিমাপ ইত্যাদি সবই যেন একীভূত ও অভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয় শিক্ষাক্রম প্রণয়নে সেদিকে খেয়াল রাখা হয়।
- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কাজসমূহও (পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান, প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় যোগান ইত্যাদি) শিক্ষাক্রমের পরিসরের অন্তর্ভুক্ত।
- শিক্ষাক্রম যে কোন শিক্ষা ধারা (আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক) এবং প্রশিক্ষণের জন্য প্রণীত হতে পারে।

শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মকে গড়ে তোলার শক্তিশালি ও কার্যকর পরিকল্পনা হল শিক্ষাক্রম। এটি শিক্ষাব্যবস্থাকে উদ্দেশ্যমুখী, সময়োপযোগী, কর্মভিত্তিক করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হল শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম ছাড়া শিক্ষাদান কার্যক্রম উদ্দেশ্যমুখী, ধারাবাহিক ও সঠিকভাবে পরিচালনা করা কঠিন। শিক্ষাদান কার্যক্রম শিক্ষাক্রম পরিকল্পনারই অংশ। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে কখন, কী ও কতটুকু শেখাতে হবে, কীভাবে শিখবে সে সম্পর্কে শিক্ষাক্রম প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়। অতএব, শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা নানামুখী।

- শিক্ষাক্রম জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শনাক্ত করে।
- সমাজ ও ব্যক্তির প্রয়োজনানুসারে শিক্ষার বিষয়বস্তু চিহ্নিত ও বিন্যস্ত করে।
- শিক্ষার্থীদের ধারণক্ষমতা অনুসারে শিখন কাজের মাত্রা নির্ধারণ করে।
- বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত উপায়ে বিষয়বস্তু বিন্যাস করে।
- বিষয়বস্তুর পারম্পর্য এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা ও সমন্বয়সাধন করে।
- শ্রেণি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণকে জোরদার করে।
- বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন প্রকার কর্মতৎপরতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বমুখী অভিজ্ঞতা অর্জনের পথ প্রশস্ত করে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির পার্থক্য

অনেকেই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে একই অর্থে ব্যবহার করেন। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে কতকগুলো সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

১। শিক্ষাক্রম একটি ব্যাপক ধারণা। পাঠ্যসূচি শিক্ষাক্রমের একটি অংশমাত্র।

২। শিক্ষাক্রম হল একটি শিক্ষাস্তরের সকল শিক্ষণীয় বিষয়ের (জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি) ও কর্মকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। আর পাঠ্যসূচি হল একটি পাঠ্যবিষয়ে কী কী বিষয়বস্তু শেখানো হবে তার তালিকা।

৩। শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য শিক্ষার্থীর সামগ্রিক জীবনের বিকাশসাধন। পক্ষান্তরে পাঠ্যসূচি শিক্ষার্থীর একটি বিশেষ দিকের বিকাশ সাধন।

৪। শিক্ষাক্রম একটি স্তরের জন্য প্রণীত হতে পারে। কিন্তু পাঠ্যসূচি একটি স্তরের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদাভাবে প্রণয়ন করতে হয়।

৫। সামগ্রিক বিচারে শিক্ষাক্রম একটি বৃক্ষ হলে পাঠ্যসূচি হবে ঐ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা।

শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাক্রম কোন স্থবির বিষয় নয়, বরং শিক্ষাক্রম প্রণয়ন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। কারণ সমাজে/দেশে/বিশ্বে সর্বত্রই প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। সামাজিক চাহিদা পূরণের স্বার্থে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষায় তার যথাযথ অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। পরিবর্তিত সামাজিক এ চাহিদার সাথে সঙ্গতি রক্ষার প্রয়োজনেই শিক্ষাক্রমের পরিমার্জন, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন প্রয়োজন হয়। কেবল সমাজেরই নয়, শিক্ষার্থীকে সমাজের

চাহিদার উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়নেও শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা প্রয়োজন। এ জন্য পৃথিবীর সকল দেশেই ধারাবাহিকভাবে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডও নিয়মিতভাবে কয়েক বছর পর পর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন/উন্নয়নের কাজটি সম্পাদন করে থাকে।

সহশিক্ষাক্রমের (Co-curriculum) ধারণা ও গুরুত্ব

শিক্ষার প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী শিক্ষাক্রমে তাত্ত্বিক জ্ঞান আহরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। শিক্ষাক্রমের আধুনিক ধারণায় শিক্ষার কাজ অনেক ব্যাপক। বর্তমানে শিক্ষা বলতে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন তথা দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বিকাশ এবং কর্মদক্ষতা, সামাজিক ও অবসর যাপনের ক্ষমতার বিকাশকে বোঝায়। এ লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশে নানা কর্মসূচি গৃহীত হয় যার রূপরেখা হলো শিক্ষাক্রম। এর মধ্যে কতগুলো শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের ভিতরে শিক্ষকের নির্দেশনায় অর্জন করে। বাকীগুলো শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষকের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে অর্জন করতে পারে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিজ্ঞতাগুলো অর্জনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কাজগুলোকে সহশিক্ষাক্রমিক কাজ বলা হয়। যেমন- খেলাধুলা, অভিনয়, বিতর্কসভা, বৃত্তিমূলক কাজ, শিক্ষা সফর ইত্যাদি।

শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে জ্ঞানমূলক চর্চার পাশাপাশি শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহশিক্ষাক্রমিক কাজগুলো সমান গুরুত্বপূর্ণ। 'সহ' বলতে এখানে সহযোগী বুঝায় না। বরং শিক্ষাক্রমের মধ্যে বর্তমান বা অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলিকেই বুঝায়। উভয় কার্যক্রমের সমন্বয়েই শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। সহশিক্ষাক্রমিক কাজ শিক্ষার্থীর সম্ভাবনার বিকাশ ঘটায়, আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে, সামাজিক বৈশিষ্ট্য গঠন করে, সহযোগিতার মনোভাব ও নেতৃত্বের গুণাবলি তৈরি করে, বিদ্যালয়ের শিখন পরিবেশকে আকর্ষণীয় করে, শৃঙ্খলাপূর্ণ মানবিক সম্পর্ক গড়ে তুলে। সর্বোপরি দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ও অবসর যাপনের শিক্ষা দেয়। কেবলমাত্র শ্রেণিকক্ষের পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক জ্ঞানমূলক চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর এসকল দিকের বিকাশ কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তা না হলে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ সম্ভব হবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য কীসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় ?
   ক. শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি
   খ. জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য
   গ. সামাজিক প্রত্যাশা
   ঘ. মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষমাত্রা

২. শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি ও পরিসর সম্পর্কিত নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক ?
   ক. শিক্ষাক্রম স্তরভিত্তিক হয়ে থাকে
   খ. শিক্ষার্থী কী শিখবে তা আলোচনা করে
   গ. শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের বিশদ পরিকল্পনা
   ঘ. আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়

৩. বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে কোন সংস্থা ?
   ক. শিক্ষা মন্ত্রণালয়
   খ. এনসিটিবি
   গ. স্ব স্ব স্কুল/কলেজ
   ঘ. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

সঠিক উত্তরঃ ১। খ; ২। গ; ৩। খ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য কীসের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয় এবং কীভাবে?
২. শিক্ষাক্রমের কাঠামো কোন কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে?
৩. শিক্ষাক্রমের পরিকল্পনায় কোন দিকগুলো বিবেচনা করা হয়?
৪. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির পার্থক্য কী?
৫. শিক্ষাক্রম ও সহশিক্ষাক্রমের পার্থক্য উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য কী? লক্ষ্য নির্ধারণে কোন কোন বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়?
২. শিক্ষাক্রমের প্রকৃতি ও পরিসর আলোচনা করুন।
৩. "শিক্ষাক্রম ছাড়া শিক্ষাদান কার্যক্রম উদ্দেশ্যমুখী, ধারাবাহিক ও সঠিকভাবে পরিচারনা করা অসম্ভব"– বক্তব্যটির যথার্থতা ব্যাখ্যা করুন।
৪. শিক্ষাক্রম কোন স্থবির বিষয় নয় কেন তা ব্যাখ্যাপূর্বক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
৫. সহশিক্ষাক্রম কী? শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য অর্জনে সহশিক্ষাক্রমিক কাজের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ১.৩: শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিমালা ও আধুনিক গতিধারা

[Principles and Modern Trends of Curriculum Construction]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিমালা উল্লেখ করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রম প্রণয়নের আধুনিক গতিধারা বর্ণনা করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন একটি ধারবাহিক প্রক্রিয়া। বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রই নিয়মিতভাবে বিভিন্ন শিক্ষার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন/পরিমার্জন/উন্নয়ন করে থাকে। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন/পরিমার্জনের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা আছে যা এক্ষেত্রে অনুসরণ করা প্রয়োজন। তা হলে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কাজটি অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। এছাড়া সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তন ও আধুনিকায়নের ফলে এমন অনেক চাহিদার সৃষ্টি হয়, যা শিক্ষাক্রমে যথার্থভাবে প্রতিফলন ঘটাতে হয়।

শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিমালা

শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কিছু একাডেমিক নীতিমালা রয়েছে। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো–

১। **শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:** শিক্ষানীতি এবং বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় দলিলে একটি রাষ্ট্রের শিক্ষার লক্ষ্য কী হবে সে সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা উল্লেখ থাকে। শিক্ষাক্রমে এসব দিকগুলোর প্রতিফলন ঘটাতে হয়।

২। **শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক:** শিক্ষাক্রম, শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ, সামর্থ, ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি দিককে ভিত্তি করে প্রণয়ন করতে হয়। অর্থাৎ শিক্ষাক্রম হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শেখার সুযোগ থাকতে হবে।

৩। **ব্যক্তির সামাজিক চাহিদার প্রতিফলন:** মানুষ সামাজিক জীব। শিক্ষার্থী সমাজেই জন্মগ্রহণ করে ও বেড়ে উঠে। আধুনিক শিক্ষা ব্যক্তির নিজস্ব সত্ত্বা ও সামাজিক সত্ত্বা উভয় দিকের বিকাশকে গুরুত্ব দেয়। শিক্ষাক্রম প্রণয়নে এদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪। **সৃজনশীলতার বিকাশ:** শিক্ষার কাজ কেবলমাত্র অতীত অভিজ্ঞতাকে সংরক্ষণ করা নয়। শিক্ষার্থী নিজস্ব সম্ভাবনা ও সৃজনশীলতার উন্নয়নও শিক্ষার কাজ। অতএব, শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার বিকাশকে গুরুত্ব দিবে। তাদের চিন্তাশক্তির বিকাশে জোর দিতে হবে।

৫। **ভবিষ্যৎমূখী করা:** শিক্ষা হবে জীবনভিত্তিক। তবে শিক্ষা শুধু বর্তমান জীবন পরিস্থিতিকেই গুরুত্ব দিবে না। শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যত জীবনের দায়িত্ব পালনেও প্রস্তুত করবে। সুতরাং শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নে যুগপৎ সমাজের ভবিষ্যত চাহিদাকেও বিবেচনা করতে হবে।

৬। **জীবন ধারনের প্রস্তুতি:** শিক্ষার্থীর পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কর্মকাণ্ড এবং এগুলোর মাধ্যমে কীভাবে ব্যক্তির জীবনের চাহিদাসমূহের পরিপূরণ হচ্ছে সে সম্পর্কে জানার সুযোগ শিক্ষাক্রমে থাকবে।

৭। **সংরক্ষণ করা:** মানবজাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের ও তাকে ভবিষ্যতমুখী করার অন্যতম মাধ্যম শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তার অর্জিত অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের মাধ্যমে আগামী দিনের পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে খাপ খাওয়ার উপযোগী দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভূমিকা দ্বিমুখী– (১) অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ এবং (২) ভবিষ্যত সমাজের মধ্যে তার সঞ্চালন। শিক্ষাক্রম প্রণয়নে এদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৮। **বিষয়বস্তুর সমন্বয় ও সহসম্পর্ক রক্ষা:** শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে বিষয়বস্তুসমূহ যৌক্তিকভাবে ও মনোবিজ্ঞানের নীতিমালা অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়। এর ফলে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যথার্থ সমন্বয় ও সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হবে।

৯। **ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যকে গুরুত্ব দেওয়া:** শিক্ষাক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে করে প্রতিটি শিশুর/শিক্ষার্থী আত্ম-প্রকাশ ও উন্নয়নের সুযোগ থাকে। এ লক্ষ্যে শিক্ষাক্রমকে ব্যক্তিক পার্থক্যের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে যা আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জটিলতা উপলব্ধি করতে ও তার সমাধানে সহায়ক হবে।

১০। **শিখন সক্ষমতা:** শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয়/বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর শেখার উপযোগী হতে হবে। সেই সাথে বিষয়বস্তুসমূহের প্রয়োজনীয়তাও থাকতে হবে।

১১। **সামাজিক সংশ্লিষ্টতা ও উপযোগিতা:** শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ এমনভাবে চয়ন করতে হবে যাতে করে শিখন ক্ষেত্র (discipline) হিসেবে তার গুরুত্ব থাকে। সেই সাথে তার নিজস্ব গুরুত্ব, সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা থাকে।

১২। **অবকাশ সময়ের সদ্ব্যবহার:** খেলাধুলা, শিল্পচর্চা, নান্দনিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অবসর সময়টাকে কার্যকর ও আনন্দঘন ব্যবহারের সুযোগ থাকবে শিক্ষাক্রমে।

১৩। **বিভিন্নতার স্বীকৃতি ও নমনীয়তা:** শিক্ষাক্রমের সাধারণ উদ্দেশ্য হবে সকলের স্বাভাবিক বিকাশ ও উন্নয়ন। তা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্নতাকে (ছেলেমেয়ে, জাতি, গোষ্ঠী, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি) মূল্যায়ন করবে ও প্রত্যেকের বিশেষ চাহিদার প্রতি গুরুত্ব আরোপ।

শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সাম্প্রতিক গতিধারা

বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশে দ্রুত সামাজিক বিবর্তন ঘটছে। এ বিবর্তনের সাথে শিক্ষার্থীদের খাপ খাইয়ে চলার জন্য কী ধরনের শিক্ষার দরকার তা নিয়ে ক্রমাগত চিন্তাভাবনা ও গবেষণা হচ্ছে। সামাজিক বিবর্তনের সূচকগুলো শিক্ষাকে নানাভাবে প্রভাবিত করছে। ফলে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে এদিকগুলো বর্তমানে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে।

১। **জ্ঞান জগতের বিস্ফোরণ:** জ্ঞান জগৎ অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন সৃষ্ট প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের পরিবর্তিত ও জটিল পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ার যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষাক্রম সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২। **প্রযুক্তিগত অগ্রগতিঃ** বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপ্লব ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে যা আমাদের প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তি উপহার দিচ্ছে। এগুলো ব্যবহার করে দ্রুত ও অধিকতর সক্ষমতার সাথে শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে এসব নবতর জ্ঞান ও প্রযুক্তি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। প্রতিযোগিতাশীল বিশ্বে টিকে থাকার জন্য এ সকল প্রযুক্তিগত জ্ঞান আহরণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এছাড়া বর্তমান যুগ আই.সি.টি.-র যুগ, যা মানুষের জীবনের সকল দিককে স্পর্শ করেছে। প্রযুক্তি আমাদের জীবনের অনেক কাজকে সহজ, সুবিধাজনক এবং মানসম্পন্ন করেছে। ফলে প্রযুক্তি নির্ভরতার এ যুগে সকলের এ বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষার অন্যতম কাজ ব্যক্তির জীবন দক্ষতাও বাড়ানো। ফলে শিক্ষাক্রমের ফলপ্রসূ বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের আই.সি.টি-এর জ্ঞান ও দক্ষতা অপরিহার্য। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায়ও এর ফলপ্রসূ ব্যবহার জরুরি। শিক্ষাক্রম প্রণেতাগণ শিক্ষাক্রম প্রণয়নে অবশ্যই এ দিকটির উপর গুরুত্ব দিবেন।

৩। **চাহিদাভিত্তিক শিক্ষাক্রমঃ** আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা চাহিদাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক চাহিদার কথা মাথায় রেখে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হবে।

৪। **একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতায় গুরুত্বারোপঃ** বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে সহযোগিতা, সূক্ষ্ম চিন্তা (critical thinking), ফলপ্রসূ যোগাযোগ দক্ষতা, দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং সহমর্মিতার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সকল বিষয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়নে একবিংশ শতাব্দীর এসব দক্ষতা অর্জনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

৫। **আন্তর্জাতিকতার ধারণাঃ** বর্তমানে বিশ্বায়নের ধারণা পুরো পৃথিবীকে একটি বিশ্ব গ্রামে (global village) পরিণত করেছে। সুতরাং পুরো বিশ্বটাকে একটি পরিবার হিসেবে ধরে নিয়ে শিক্ষাক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার মনোভাবের বিকাশ ও প্রসার ঘটাতে হবে। শিক্ষাক্রমের কাজ হবে শিক্ষার্থীদের জন্য এ ধরনের পরিবেশ তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করা।

৬। **গঠনবাদ(**Constructivism)**ঃ** বর্তমানে গঠনবাদকে শিক্ষার একটি মৌলিক নীতিমালা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গঠনবাদে বিশ্বাস করা হয় যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কোন বিষয় সম্পর্কে তার নিজস্ব ধারণা গঠনের স্বাধীনতা দিতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে জোর করে কিছু শেখানো বা মুখস্থ করে শেখানোর উপায় পরিহার করতে হবে। শিক্ষার্থীকে শিখন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে শেখাতে হবে। যদি শিক্ষার্থী জ্ঞান/ধারণা গঠনে পুরোপরি সক্রিয় থাকে তাহলে শিখন প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ হবে। অতএব, সকল শিক্ষাক্রমে গঠনবাদের ভিত্তিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে হবে।

৭। **বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধনঃ** বর্তমানে বহু দেশ শিক্ষার বিষয়বস্তুর কয়েকটি ক্ষেত্রকে সংগঠিত করে একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করার উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন বিষয়ে সামগ্রিক জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের সুযোগ ঘটে, যা বাস্তব সমস্যা সমাধানে অধিকতর কার্যকরী হয়। শিক্ষাক্রম প্রণয়নে এদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

৮। **কৃতিত্ব মূল্যায়নে গুরুত্বারোপঃ** বর্তমানে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পরিমাপে প্রথাগত ২/৩টি আনুষ্ঠানিক সাময়িক পরীক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে ধারাবাহিক মূল্যায়ন, সমস্যা সমাধান, বাস্তবভিত্তিক ব্যবহারিক কাজ, মৌখিক পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব অধিকতর সূচারুরূপে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

শিক্ষাক্রম প্রণয়নে উপরিল্লিখিত দিকগুলো যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা উচিত। শিক্ষাক্রম প্রণেতাগণ এ বিষয়ে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্টজনদের সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার ধরন, মূল্যায়ন ইত্যাদি নির্ধারণ করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কীসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়?
   ক. সামাজিক চাহিদা
   খ. আন্তর্জাতিক দলিল
   গ. রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় দলিল
   ঘ. শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের চাহিদা

২. শিক্ষাক্রমকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করতে হলে কোন বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে?
   ক. শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ
   খ. সামাজিক চাহিদা
   গ. সৃজনশীলতার বিকাশ
   ঘ. জীবনভিত্তিক করা

৩. গঠনবাদের মূলকথা কী?
   ক. শিক্ষার্থীকে জোর করে কিছু শেখানো
   খ. শিখন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শেখা
   গ. একা একা শেখা
   ঘ. শিক্ষকের নির্দেশনায় শেখা

৪. বিশ্বের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হলে শিক্ষার্থীদের জন্য কী অপরিহার্য?
   ক. নতুন জ্ঞান সম্পর্কে জানা
   খ. বিশ্বায়নের ধারণা
   গ. আইসিটির জ্ঞান ও দক্ষতা
   ঘ. ফলপ্রসূ যোগাযোগ দক্ষতা

সঠিক উত্তরঃ ১। গ; ২। ক; ৩। খ; ৪। গ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম প্রণয়ন/পরিমার্জনের কাজটি কীসের ভিত্তিতে হওয়া উচিত এবং কেন?

২. শিক্ষাক্রম কীভাবে মানবজাতির অর্জিত অভিজ্ঞতাকে সংরক্ষণ করবে?

৩. শিক্ষাক্রম প্রণয়নে ব্যক্তিগত পার্থক্যকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত কেন?

৪. শিক্ষাক্রম প্রণয়নে গঠনবাদের গুরুত্ব তুলে ধরুন।

৫. একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতাগুলো কী? শিক্ষাক্রমে এগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কী?

৬. আধুনিক শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়নে কোন দিকগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত? কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম প্রণয়নে একাডেমিক নীতিমালাগুলো আলোচনা করুন।

২. শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সাম্প্রতিক চাহিদাগুলো বর্ণনা করুন।

৩. বর্তমান বিশ্বে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বিপ্লবের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন এবং এর সাথে সঙ্গতি রক্ষায় শিক্ষাক্রমে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন উল্লেখ করুন।